Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Issue-IV, July 2023, Page No.79-86
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

শিক্ষা ভাবনায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী

সুমিত পাল
গবেষক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সন্তোষ মুখার্জী
অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ,স্বামী বিবেকানন্দ ইউনিভার্সিটি, ব্যারাকপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

ড. সমীর রঞ্জন অধিকারী
অধ্যাপক, শিক্ষাবিজ্ঞান বিভাগ, সিধো- কানহু বীরসা ইউনিভার্সিটি, পুরুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Jatindramohan Bagchi was one of the prominent poets of post-Rabindra Bengali era. In many of his poems, the picture of the daily life of the illiterate, poor common people has emerged. In his famous poem "Kajla Didi", the poet beautifully expresses the heart-wrenching longing to get back his lost sister. In the poems of his nine poetry collection, the beauty of rural nature and the joys and sorrows of rural life and the downtrodden women have been expressed. He was an admirer of the famous David Hare, (Scottish watchmaker and philanthropist).His nameless prose was"David Hare." In this text here the relationship between teacher and student is very well presented. One more thing is clear in his writings that even after death a teacher may live in the memories of his beloved students. Although the poet Jatindramohan Bagchi was not directly connected in the field of education, but the Bagchi family was it a school of free thinking at that time. Jatindra Mohan Bagchi's writing uses very few comparatives which are very understandable to the reader.Some of his poems deal with the tender nature of a child and childhood.Just as Jatindramohan Bagchi's contribution in the field of literature is undeniable, he has also guided us in various ways in the field of education.

Key words: Kajala Didi, Heart-wrenching, Philanthropist, Downtrodden

"বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই"?

বেশিরভাগ মানুষেরই ভীষণ পরিচিত এই কবিতাটি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই কবির নাম অনেকেরই অজানা রয়ে গেছে। হৃদয়গ্রাহী এই কবিতাটি লিখেছেন কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী। যিনি রবীন্দ্র পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একজন অন্যতম প্রধান কবি হিসেবে বিবেচিত।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী নদীয়া জেলার করিমপুর সংলগ্ন জমশেরপুর গ্রামের উচ্চবিত্ত সম্পন্ন জমিদার বাগচী পরিবারে ১২৮৫ বঙ্গাব্দের ১২ই অগ্রহায়ন, ইংরেজি ২৭ শে নভেম্বর ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা হরিমোহন বাগচী ও মাতা গিরিশ মোহিনী দেবী। এই পরিবারের জ্ঞানেন্দ্রনারায়ন বাগচী ও কবি দ্বিজেন্দ্র নারায়ণ বাগচী ওই সময় সাহিত্য জগতে বিখ্যাত।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রতাপশালী জমিদার পরিবারের সন্তান হলেও সাধারণ মানুষের সাথে মিশেই তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়েছে। আর প্রাথমিক শিক্ষা লাভ তার নিজস্ব গ্রাম জমশেরপুর ছাত্র বৃত্তি বিদ্যালয়, এরপর মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়া মিশনারি স্কুলে হয়। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভর্তি হন কলকাতার হেয়ার স্কুলে, তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এফ.এ পাস করেন। অতঃপর তিনি ১৯০২ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাস করেন কলকাতার ডাফ কলেজ (এখন স্কটিশ চার্চ কলেজ) থেকে।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কর্মজীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। তিনি নানা ধরনের কাজ করেছেন।প্রথম জীবনে তিনি বিচারপতি সারদাচরণ মিত্রের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিলেন, এবং এই সময়কালেই কলকাতার সাহিত্যিক মহলে তিনি পরিচিত হন।এরপর কলকাতা কর্পোরেশনের লাইসেন্স ইন্সপেক্টর, তৎপরে নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এর প্রাইভেট সেক্রেটারির কাজ করেন।মহারাজের মৃত্যুর পর কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী জীবিকা অন্বেষণের জন্য নানা ক্ষেত্রে বিচরণ। এফ.এম.গুপ্তা পেন্সিল কোম্পানিতে, ১৯৩৭-১৯৩৮ সালে বাজপেয়ী কোলিয়ারিতে, কখনো আবার স্বাধীন ব্যবসায়ী হিসেবেও কাজ করেছেন।

সাহিত্য জীবনে কাজী নজরুল ইসলাম, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখের স্নেহ সহচার্য লাভ করেছিলেন। তাঁর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই পল্লী নিবিষ্টতা। তিনি গ্রামকে ভীষণ ভালবাসতেন। প্রকৃতির বৈচিত্র্য ও গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন কাহিনী নিজের গ্রামে থেকে উপলব্ধি করে সুন্দর সহজ সরল ভাষায় তাঁর লেখনীতে ফুটিয়ে তুলেছেন। যতীন্দ্রমোহনের রচনার বিষয়বস্তু ছিল সৌন্দর্য পিপাসা ও মানবতা। তাঁর কবিতাগুলিকে বিষয় নির্বাচনের নিরিখে কোন একটি বিশেষ ভাবধারায় চিহ্নিত করা যায় না।

গবেষণার উদ্দেশ্য: গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষা ভাবনায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর ভূমিকা পর্যালোচনা করা। শিক্ষা প্রসারে তাঁর অবদান শিক্ষাবিজ্ঞানের ইতিহাস চর্চার বিশেষ সহায়ক হবে কি না, তা দেখা।

শিক্ষা ভাবনায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অবদানের ক্ষেত্রে প্রশ্ন হল- "শিক্ষা ভাবনায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর কী কোনো অবদান আছে"?

গবেষণা পদ্ধতি: এই গবেষণাটি আসলে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি (Qualitative Research)। বিশেষত আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে গবেষণাটি পরিচালিত করা হবে।

উপাত্ত সংগ্রহ পদ্ধতি: উপাত্ত গবেষণার অন্যতম সহায়ক। উপাত্ত বিশ্লেষণ করেই তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। উপাত্ত গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

অ) প্রাথমিক উপাত্ত (Primary data): প্রাথমিক উপাত্ত হিসাবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর স্বরচিত গ্রন্থ গুলি বিবেচিত হয়েছে। যেমন লেখা, রেখা, অপরাজিতা, নাগকেশর, জাগরণী, নীহারিকা, মহাভারতী ইত্যাদি।

আ) গৌণ উপাত্ত (Secondary data): বর্তমান গবেষণায় গৌণ উপাত্ত হিসেবে যে বিষয়গুলো বিবেচিত হয়েছে সেগুলি হল –

(ক) যতীন্দ্রমোহন বাগচীর জীবনী তথ্য,
(খ) তাঁর জীবনী ও সাহিত্য সম্পর্কিত বহুবিধ লেখক-এর আলোচনা,
(গ) যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থ,
(ঘ) বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা (যতীন্দ্রমোহন বাগচী সম্পর্কিত লেখা),
(ঙ) মুদ্রিত ও অমুদ্রিত নথিপত্র প্রভৃতি।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ: ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে প্রাপ্ত প্রাথমিক উপাত্ত ও নানা মাধ্যমে প্রকাশিত বিষয়বস্তু থেকে প্রাপ্ত গৌণ উপাত্তর বস্তুনিষ্ঠ ও প্রণালীবদ্ধ বর্ণনার একটি গবেষণা কৌশল হলো বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ। বিভিন্ন সামাজিক নিদর্শন শিল্প-কর্ম, বই, চিঠিপত্র, জার্নাল, চিত্রকর্ম, সংবাদপত্র ও অন্যান্য দৃষ্টিকার্য মৌখিক ও লিখিত ডকুমেন্ট এই পদ্ধতিতে উৎসের উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে আরও বোঝা গেছে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সরাসরি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা না করলেও তার পরিবার ছিল সেই সময়কার মুক্ত চিন্তার পাঠশালা। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখা কবিতা অনেক সহজ সরল, যুক্তাক্ষর এর ব্যবহার অনেক কম। শিশু পাঠ্যপযুক্ত অনেক বই তিনি লিখে গেছেন। উপাত্ত সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণ, ক্ষেত্র সমীক্ষা ও পুস্তক অধ্যায়নের মাধ্যমে সংগ্রহীত উপাত্ত গুলি থেকে আগেও বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে তথ্য ও নিষ্কাশন করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল: গবেষণা কর্ম সমাপ্তের উপর নির্ভর করে, গবেষণা কর্মের ফলাফল। উপাত্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে যে তথ্য উঠে এসেছে, তার ভিত্তিতে গবেষণার ফলাফল গৃহীত হয়েছে।

ডেভিড হেয়ারের শিক্ষা ভাবনায় কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী: যতীন্দ্রমোহন বাগচী ডেভিড হেয়ার কে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। এই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে তিনি 'ডেভিড হেয়ার' নামে একটি গদ্য রচনা করেন। সেখানে তিনি লেখেন –

> "তোমাদের মধ্যে অনেকেই বোধ হয় মহামতি হিয়ার সাহেবের নাম শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার মতন ছাত্রগণের অকৃত্রিম বন্ধু এ পর্যন্ত আর কেহ জন্মিয়াছেন কিনা, জানিনা। তাই, প্রত্যেক ছাত্রেরই অতি শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার নাম মনে রাখা কর্তব্য। স্কটল্যান্ডের এবারডিন নগরে তাঁহার জন্ম। ২৫ বৎসর বয়সে সেখান হইতে ঘড়ির ব্যবসা করিবার জন্য তিনি কলকাতায় আসেন এবং এই ব্যবসায়ে অনেক টাকা রোজগার করেন। ওই টাকা ছাত্রদের শিক্ষাদানে তিনি ব্যয় করিয়া গিয়েছেন"।

এখানে ডেভিড হেয়ারের শিক্ষাক্ষেত্রে তার অবদানকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেছেন। সমস্ত শিক্ষার্থীকেই তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তাকে মনে রাখার অনুরোধ জানিয়েছেন। এখান থেকে একটি জিনিস লক্ষ্য করা যেতে পারে যে , যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ ও ভালোবাসা ছিল।

তিনি আরও লেখেন – "তিনি যখন কলকাতায় আসেন, তখন ইংরেজি শিক্ষার কোনও রূপ ভালো ব্যবস্থাই এখানে ছিল না। ছাত্রদের পড়িবার উপযোগী ভালো বইও বড় কিছু মিলিত না। তিনি প্রথম হইতেই মনে মনে বুঝলেন, শিক্ষার ব্যবস্থা ছাড়া এদেশের প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। তাই এখানকার প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া 'স্কুল সোসাইটি' নামে একটি সমিতি গঠন করিয়া নিজে তাহার

একজন সভ্য হইলেন এবং কলিকাতার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্কুল প্রতিষ্ঠা করিলেন। কিন্তু স্কুলে পড়াইবার মতো ভালো বই ও নাই,- পড়াইবেন কি? তাই, রাজা রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি বিশিষ্ট লোকের সাহায্য লইয়া একটি 'পাঠ্যপুস্তক সমিতি' ও স্থাপন করিলেন। এই সমিতি দ্বারা ভালো পাঠ্যপুস্তক রচিত হইল"।

এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দিলেও, তার পাশাপাশি ইংরেজি শিক্ষার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। যতীন্দ্রমোহন বাগচী নিজে কোন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা না করলেও তাঁর প্রভাবেই তাঁরই পরিবারের একজন জমিদার, নারায়ন বাগচী তাঁর পুত্র ভূপেন্দ্র নারায়ন বাগচীর নামে জমশেরপুরে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। যা এখন বর্তমানে জমশেরপুর বি.এন.হাই স্কুল নামে পরিচিত।

কবির লেখায়:

> ..... "শিক্ষাদানের কার্যের শেষ দিন পর্যন্ত কাটাইয়া ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে বিশুচিকা রোগে তাহার মৃত্যু হয়। শোনা যায় তিনি নাকি মৃত্যুর পূর্বে বলিয়া যান ছাত্রদের ছাড়িয়া তিনি কোথাও স্থির থাকিতে পারিবেন না; তাই তাহার স্কুলের কাছেই গোল দিঘির ধারে তাহার সমাধি হইয়াছিল"।

এখান থেকে বোঝা যায় একজন আদর্শ শিক্ষকের কখনো মৃত্যু হয় না। একজন আদর্শ শিক্ষক মৃত্যুর পরেও তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারেন। যতীন্দ্রমোহন বাগচী ও অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন।

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত "সাহিত্য সঞ্চয়" এর অন্তর্গত গদ্যাংশ "স্বাস্থ্যচর্চা"। এখানে তিনি সকল ছাত্র-ছাত্রীদের সুস্বাস্থ্যের কামনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন,-

> "তোমরা সকলে স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হইয়া বাল্যকাল হইতে পড়াশুনার মতন অবশ্য কর্তব্য বুঝিয়া স্বাস্থ্য চর্চা করিয়া দেশের ও দশের কাছে বাঙালির মুখ রাখিবে ও নিজে যশস্বী হইবে, এই কামনা করি"।

কবি যতীন্দ্রমোহনের কবিতায় শিশু মনের কথা একাধিকবার উঠে এসেছে। তাঁর প্রথম কাব্য সংকলন "লেখা" (১৩১৩ বঙ্গাব্দ /১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ) এর অন্তর্গত কবিতা "শিশুর রহস্য",সেখানে তিনি লেখেন -

"কহিতে না জানে কথা- মুখে ভাঙা ভাষ,
চলিতে পারে না, সদা চলিবার আশ;
হাসি কি জানে না, মুখে হাসি আছে ফুটে,
কান্না অর্থহীন ,চুম্বনেতে কেঁদে উঠে ;
ভাবুক নহেক তবু খেয়ালেতে আছে,
আকাশের চাঁদেরে সে মিতা করিয়াছে;
ভালো মন্দ নাহি বুঝে, যা পাই তা খায়
মায়ে মারে ,তবু ফিরে' মা'রি কাছে যায়;
রাত দিন ধুলো মাখে তবুও সুন্দর,
হাসিতে ফুটিয়া উঠে কলিকা কুন্দর;
ধর্মের ধারে না ধার - কৃষ্ণ কিংবা যীশু,

লজ্জাহীন নগ্নকায় অধার্মিক শিশু !
সর্বলোক - শিশু পিতা বিধাতার বরে,
অকলঙ্ক শিশু বেশে মানবের ঘরে"!

কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী সৃষ্ট সাহিত্য খুব বেশি না হলেও তাঁর সামান্য কিছু লেখনির মাধ্যমে তাঁর সৃষ্টিশীলতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেটা অন্যান্য শিশু সাহিত্যিক বা কবিদের মতোই বাংলা শিক্ষাকে সমৃদ্ধ করার উপাদান হিসেবে উঠে এসেছে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায় তাদের সৃষ্টি সম্ভার কোন না কোন ভাবে বাংলা শিশু সাহিত্যকে যেমন সমৃদ্ধ করেছে, ঠিক একইভাবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সৃষ্ট কবিতা, বাংলা শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। তাঁর কবিতাতে শিশুদের নানা দিক উঠে এসেছে। একজন শিশু, সমাজের সমস্ত কলঙ্কমুক্ত, সে নিষ্পাপ। সে ধর্ম বোঝেনা, ধর্ম নিয়ে হানাহানি বোঝেনা। এটা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সমাজের প্রতি তাঁর বিশেষ বার্তা যা সমাজের সকলের শিক্ষণীয়।

তাঁর এই কবিতা সহজ সরল ভাষায় লেখা, যা বাংলার শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেছে। দ্বিতীয় কাব্য সংকলন "রেখা"(১৩১৭ বঙ্গাব্দ /১৯১০ খ্রিস্টাব্দ) এর অন্তর্গত "শিশুর বাণিজ্য" সেখানে তিনি বলেন –

"……দু'হাত দিয়ে বিলিয়ে দিলেও তোদের আনা ধন,
লক্ষগুণে বাড়বে ছাড়া কমবে না কখন।
জ্ঞান - ই তোদের মুক্তোমাণিক, ধর্ম তোদের হীরে-
সকল রতন চেয়ে যতন করিস এ দুটি রে"।

একজন সাহিত্যিক কিন্তু শুধুমাত্র বিনোদনের জন্য সাহিত্য রচনা করেন না। কিছু কিছু সময় তাঁরা তাদের লেখনীর মাধ্যমে সমাজের জনসাধারণকে কিছু বার্তা দিয়ে থাকেন। যেটাকে আমরা 'বাংলার লোকশিক্ষা' বলে আখ্যায়িত করতে পারি। লোকসংগীত, লোকোশিল্পের মত লোকশিক্ষাটিও জন মানষকে শিক্ষিত করে। যেকোনো রচনা, যদি কোন শিক্ষা সমাজকে না দিতে পারে, তাহলে সেই সাহিত্যের সার্থকতা সেইভাবে পাই না। উপরিউক্ত রচনায় যতীন্দ্রমোহন বাগচী দান-ধ্যান করার জন্য সবাই কে আহ্বান জানিয়েছেন। দান-ধ্যান যেমন সমাজকে সমৃদ্ধ করে, ঠিক তেমনি জ্ঞান ও ধর্মকে তিনি মুক্তমানিকের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এটা একটা বড় শিক্ষা জনগণের জন্য, সেটা হলো ধনকে নিজের মধ্যে কুক্ষিগত না করে সমাজের মধ্যে বিলিয়ে দিলে সেই সমাজের শ্রী বৃদ্ধি হবে উত্তরাত্তর। আর ঠিক তেমনিই মানিক মুক্তোর চেয়েও জ্ঞান সঞ্চয় মানুষের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞানের বিকল্প কিছু হতে পারে না। তাঁর জ্ঞানের প্রতি যে অনুরাগ সেই শিক্ষাটা সমাজের প্রত্যেকের প্রতি দিয়েছেন বা জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলেছেন। আর ধর্মের কথা বলতে তিনি মানব ধর্মকে সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। যা সমাজের শিক্ষা ভাবনায় তাঁর ছাপ তিনি রেখে গেছেন।

"বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই,
মাগো আমার শোলক-বলা কাজলা দিদি কই"?
পুকুর ধারে, নেবুর তলে থোকায় থোকায় জোনাই জ্বলে,-
ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না, একলা জেগে রই;
মাগো, আমার কোলের কাছে কাজলা দিদি কই?

কাজলা দিদি কোন নীতি কথার রচনা নয়। এটা কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অসামান্য রচনা। এটি কবিতা হিসেবেই নয় গীতি কবিতা হিসেবে ও সম্পূর্ণ একটি রচনা। তার জন্যই এটা মানুষ গান হিসেবেও মনে রেখেছেন। এই কাজলা দিদি কবিতাটি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সফল কবিতা হিসেবে আমরা তুলে ধরতে পারি। একটি সফল কবিতা যেভাবে শিক্ষা বিস্তারে কাজে আসে যেমন মাতৃভাষা চর্চা ও শিশু পাঠ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। পাঠ্য পুস্তকে বাংলাদেশ ও ভারত দুই দেশেই যথেষ্ট সফল কবিতা হিসেবে স্থান পেয়েছে। "বাঁশ বাগানের মাথার উপর চাঁদ উঠেছে ওই" এই কবিতার লাইন দুই দেশের মানুষের রন্ধে রন্ধে রন্ধ্রে মিশে গিয়েছে। শিশু কবিতা হিসাবে ও 'কাজলা দিদি' একটি সফল কবিতা। এই কবিতার মাধ্যমে শিশুর কল্পনার মধ্য দিয়ে বাস্তবিক ধারণা তৈরি হয়। যেমন বাঁশবাগান, চাঁদ ওঠা, লেবুরতলা, জোনাকি, শোলক ইত্যাদি। এর ফলে শিশুর চিন্তাভাবনার বিকাশ ঘটে এবং সর্বোপরি শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করে। এই কবিতাটি খুব সুন্দর ছন্দময় অলংকারে সাজানো , খুব সহজেই মনে রাখা যায়, সুরেলা ভাব রয়েছে, ফলে শিশুদের কাছে এই কবিতাটি অন্যান্য কবিতার থেকে গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি।

তাঁর কবিতায় আছে নাট্যধর্মীতা-ও গীতিময়তা। যতীন্দ্রমোহন শুধুমাত্র ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কবিতা বা নিসর্গচিত্রের রচয়িতাই ছিলেন নাপ্রেমের সুমধুর কবিতাও তিনি লিখেছেন। হাইনরিখ হাইনের অনেক , অগ্রন্থিত। যতীন্দ্রমোহনকে রবীন্দ্রানু যদিও সেগুলো ,কবিতা তিনি একসময় অনুবাদ করেনসারী কবি বলে চিহ্নিত করা ঠিক নয়। রবীন্দ্রধারায় কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন একথা সত্য, কিন্তু তাঁর প্রতেকটি লেখায় নিজস্বতা লক্ষ্য করা যায়। যতীন্দ্রমোহন কাহিনীমূলক কবিতা রচনায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তাঁর কবিতার মধ্যে সেরা কবিতা যেমন, লেখা (১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ), রেখা (১৯১০ খ্রিস্টাব্দ), অপরাজিতা (১৯১৩ খ্রিস্টাব্দ), নাগকেশর (১৯১৭ খ্রিস্টাব্দ), বন্ধুর দান (১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ), জাগরনী (১৯২২ খ্রিস্টাব্দ), নীহারিকা (১৯২৭ খ্রিস্টাব্দ), মহভারতী (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ), কাব্যমালঞ্চ (১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দ), পাঞ্চজন্য (১৯৪১ খ্রিস্টাব্দ), রবীন্দ্রনাথ ও যুগসাহিত্য (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দ) - তিনি নিজস্ব স্বকীয়তাই রচনা করেন।

মানসী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য, ভারতী, প্রবাসী, সাধনা, সবুজপত্র, মর্মবাণী, পূর্বাচল, যমুনা ইত্যাদি পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে তিনি লিখেছেন। বিভিন্ন পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। তিনি মানসী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৯০৯-১৯১৩খ্রিস্টাব্দ , যমুনা পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ১৯২১-২২ খ্রিস্টাব্দ (১৩২৮ ও ১৩২৯ বঙ্গাব্দ) এবং মর্মবাণী পত্রিকার সঙ্গে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে (১৩২২ বঙ্গাব্দে) তাকে যুক্ত দেখা যায়। তিনি প্রথম সংখ্যা থেকে আমৃত্যু পূর্বাচল পত্রিকার সম্পাদকও ছিলেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিক রাজশেখর বসু (পরশুরাম) যতীন্দ্রমোহনকে 'গদ্যে পদ্যে সার্বভৌম' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন 'কবি কুলেশ্বর' উপাধিতেও ভূষিত হন, কিন্তু তিনি কখনও সেই উপাধি ব্যবহার করেননি। যতীন্দ্রমোহন সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদার লিখেছিলেন, "রবীন্দ্রোত্তর বাংলাকাব্যে বাংলাভাষা যাহারা রক্ষা করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে যতীন্দ্রমোহন অগ্রগণ্য"।

সিদ্ধান্ত গ্রহণ: কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচী নদীয়া জেলার একজন সমাজ সচেতন সু -নাগরিক ও অন্যতম বিখ্যাত কবি। তিনি যে সময় জন্মগ্রহণ করেন তাঁর সমসাময়িক বিখ্যাত কবিগণ এই বাংলার পুণ্য ভূমিতে পদার্পণ করেন। এর ফলে তিনি থেকে গেছেন আমাদের বিস্তৃতির আড়ালেই। যতীন্দ্রমোহন বাগচী যা কিছু প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন তা প্রধানত কবি রূপেই। আসলে তিনি প্রথম থেকেই কাব্য সাধকের ভূমিকায়

ব্রতী হয়েছিলেন। শিক্ষাক্ষেত্রে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর অবদান স্মরণ করার মত। তাঁর লেখায় শিশুর মনের ব্যথা, শিশুর আচারণ, শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের কথা ও শিশুর নিরাপত্তার চাহিদার উল্লেখ রয়েছে। সুনাগরিক, নীতিবোধ , শিক্ষক শিক্ষার্থীর সুসম্পর্কের কথা, শিক্ষার্থীর সুস্বাস্থ্যের কথাও এসেছে তাঁর লেখনীতে। স্বামীজীর কথায় – "মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার সম্পূর্ণ বিকাশ সাধনায় শিক্ষা"। এখানে শিক্ষা সম্পর্কে স্বামীজি যে ধারণা পোষণ করেছেন তার কিছুটা প্রভাব যতীন্দ্রমোহন বাগচীর লেখনীতে দেখা যায়। এখান থেকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারি যে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর অবদান যেমন অনস্বীকার্য , ঠিক তেমনিই শিক্ষাক্ষেত্রেও তিনি আমাদের পথনির্দেশ করে গেছেন বিভিন্নভাবে।

গ্রন্থপরিচয়:

১) ঘোষ, জ্যোতির্ময়। (১৯৮৫) 'যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড)। পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

২) ঘোষ,জ্যোতির্ময়।(১৯৮৭) 'যতীন্দ্রমোহন রচনাবলী' (দ্বিতীয় খণ্ড) পঃবঃ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ।

৩) চৌধুরী, গীতা। (১৯৭৮) 'আমার বাবা', দেশ পত্রিকা। ৮২ নম্বর পৃষ্ঠা।

৪) ভাদুড়ী, ঈশিতা। (২০১৬) 'যতীন্দ্রমোহন বাগচী' সাহিত্য একাডেমি। কোলকাতা-০৯।

৫) রায়, অলোক। (একত্রিত সংস্করণ : মাঘ ১৪২৬ /জানুয়ারি ২০২০) 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা' , (দ্বাদশ খন্ড) ,বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষ 2 4 3 /১ আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড কলকাতা ৭০০০৬। (পৃষ্ঠা নম্বর ১১৪ - ১২৫)

৬) রায়, অলোক। (পরিবর্ধিত তুলসী সংস্করণ: বই মেলা ২০১০) 'যতীন্দ্রমোহন কবি ও কাব্য' ,তুলসী প্রকাশনী,৯/৭ বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৯ ,

৭) সিংহ রায় ,গোরা। (পুনমুদ্রণ: মাঘ ১৪২৬/জানুয়ারি ২০২০) 'যতীন্দ্রমোহন বাগচীর শ্রেষ্ঠ কবিতা' , ভারবি প্রকাশনী, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩।

৮) সেনগুপ্ত ,অচিন্ত্য কুমার। (দ্বাদশ প্রকাশ : মাঘ ১৪২৬) 'কল্লোল যুগ', এম. সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০৭৩।

৯) হালদার, গোপাল। (মাঘ ১৪১৯) 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা' (দ্বিতীয় খন্ড) অরুণা প্রকাশনী কলকাতা ৭০০০০৬ .

১০) মুখোপাধ্যায়, অরুন কুমার। (সেপ্টেম্বর ২০২০/ আশ্বিন ১৪২৭) 'রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ' , দে'জ পাবলিশিং ,১৩ , বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট ,কলকাতা ৭০০০৭৩

১১) বসু ,স্বপন। চৌধুরী, ইন্দ্রজিৎ। (২৯ শে মে ২০১৯) 'উনিশ শতকের বাঙালিজীবন ও সংস্কৃতি' পুস্তক বিপণী, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯।

১২) গঙ্গোপাধ্যায়, আশা। (১৩৬৮) 'বাংলা শিশু সাহিত্যের ক্রমবিকাশ' সোম পাবলিশিং, ২১ , কানাই ধর লেন, কলকাতা ৭০০০১২।

১৩) জালাল, খালিদ বিন। (ফেব্রুয়ারি,২০২০/ফাল্গুন, ১৪২৬) 'নাটোরের ইতিহাস ও ঐতিহ্য', (প্রথম খন্ড) বই পত্র, ৩৮/৪ বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০ বাংলাদেশ।

১৪) পাল, সমর। (১৯৮৫) নাটোরের ইতিহাস, গতিধারা, ৩৮/২ ক বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০,বাংলাদেশ।

১৫) হক, ফজলুল। (ফেব্রুয়ারি ১৯৯২/ মাঘ ১৩৯৮) 'মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়' (১৮৬৮- ১৯২৬)। বাংলা একাডেমি, ঢাকা, বাংলাদেশ।

১৬) হোসেন, সেলিনা। ইসলাম, নূরুল। (মাঘ ১৪০৩ / ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭) বাংলা অ্যাকাডেমী চরিতাভিধান, বাংলা একাডেমি, ঢাকা,বাংলাদেশ।

১৭) 'কবিতা সংগ্রহ' , ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, (পৌষ ১৩৯৯ /ডিসেম্বর ১৯৯২)।